রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতি-চিন্তা*

আনিসুর রহমান

১। রবীন্দ্রনাথ একজন গভীর প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন। তিনি যে শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য পান করে গেছেন তাই নয়, প্রকৃতিকে তিনি আমাদের স্বত্তারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখেছেন আর প্রকৃতির স্পন্দন তাঁর কাছে ছিল সঙ্গীত যা তাঁকে মিস্টিক রস এনে দিতো। আধুনিক কালে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপি যে উদ্বেগ বেড়ে চলেছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চিন্তা এই উদ্বেগকে এক গভীর অর্থ দেয়, যে-অর্থ আমরা বোধ হয় সচেতনভাবে আমাদের চিন্তায় যতেষ্ট গুরুত্ব সহকারে ধারণ করছিনা।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি শুধু রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর প্রকৃতি চিন্তার আলোচনা করবো। বলাই বাহুল্য, কবির গান তাঁর কবিতারই অংশ, এবং এতে একজন 'চিন্তাবিদ'-এর চাইতে একটি কবি মনেরই প্রকাশ, যা যুক্তি ছাড়িয়ে মানুষের মনের রোমান্টিক চেতনাকে পরিবেশন করে। এও বলা বাহুল্য যে আমাদের ভেতরে যে রোমান্টিক মনটি রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন আচরণে তার প্রভাব কম নয়। এই মনটি আমাদের চরিত্রের একটি 'আবাস'-স্বরূপ যা আমাদের গভীরতম পরিচিতি দেয়, এবং আমাদের যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ও রোমান্টিক মন একত্রে আমাদের কর্মকান্ড পরিচালিত করে। এইজন্য আমাদের রোমান্টিক মনের ইতিবাচক উপাদানগুলি বোঝা ও তাদের সমৃদ্ধ করা আমাদের জীবনের স্বাস্থ্যকর বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

২। আমি প্রথমে রবীন্দ্রনাথের গানে প্রকৃতি চেতনার মিষ্টিক দিকটি কিছুটা দেখাবো। এই উপাদানটি যেন "অসীমের স্পন্দন", যাকে কবি কখনো কখনো বলেছেন যেন বিশ্বস্রষ্টার বীণা থেকে সুর নিসৃত হয়ে প্রকৃতির স্পন্দনের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের চোখে সৃষ্টির সব কিছুরই দুটি সত্তা আছে। একটি সত্তা বস্তুগত যাকে মেপে ওজন করে নেড়ে-চেড়ে দেখা যায়। আর একটি সত্তা অনির্বচনীয়, যাকে মাপা-ধরা-ছোঁয়া যায় না, যা একটি স্পন্দন, আমাদের চেতনার গভীরতম তার নীরবে ঝঙ্কার দিয়ে চলেছে। কবি সৃষ্টির এই সত্তাটিকেই বলেছেন বিশ্বস্রষ্টার বীণার সঙ্গীত - অসীমের গান। এই গান প্রকৃতি নিরন্তর গেয়ে চলেছে - তার বনের মর্মরে, ফুলের আপনাকে মেলে ধরায়, নদী-ঝরনার কলকলে, সাগরের ঢেউয়ের দোলায়, সবুজ ঘাসের নিঃশ্বাসে, নীল আকাশে মেঘের ভেসে যাওয়ায়।

যেমনঃ

> বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে।
> স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
> নদী-নদে গিরিগুহা-পারাবারে
> নিত্য জাগে সরস সংগীত মধুরিমা,
> নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।

এভাবে তাঁর গানে এই সংগীতের বন্দনা বারে বারে ব্যক্ত হয়ে চলেছে :

> তোমার সুর ফাগুনরাতের জাগে,
> তোমার সুর আশোকশাখে অরুণরেনুরাগে....

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির ওপর গানগুলি প্রকৃতির সৌন্দর্যের বন্দনায় ভরা। এটি অবশ্য কবিদের কবিতায়-গানে থাকেই। শুধু কবি কেন, সৌন্দর্যরসিক মানুষ মাত্রই প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে তিনি প্রকৃতিকে মানুষের সত্তার, তার পরিচয়েরই একটি অংশ হিসেবে দেখেছেন, এবং এই চেতনার গভীরতার তিনি আর সব কবি থেকে ওপরে। তাঁর চেতনায় প্রকৃতি তার পরিবর্তনশীল রূপ-রস নিয়ে আমাদেরই পরিবর্তনশীল চিন্তা-আবেগ-আকুতিকে বয়ে নিয়ে যায় স্থান ও কালের ব্যবধান পার করে এবং এইভাবে দূরের মানুষের সঙ্গে, সর্বকালের মানুষের সঙ্গে, এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গেও, আমাদের মিলন ঘটিয়ে দেয়। এইভাবে প্রকৃতিকে, তার সৌন্দর্য ও তার সেবাকে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবনেরই একটা অর্থ।

এই যে গভীর প্রকৃতি-চেতনা কবি আমাদের দিয়ে গেছেন, সেই চেতনা বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ নিয়েছে যা তাঁর প্রকৃতি-সংগীতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গীতবিতানের প্রকৃতি পর্যায়ের পাতা উল্টিয়ে যেয়ে বিভিন্ন ঋতুতে কবি প্রকৃতিকে যেভাবে দেখেছেন এবং আমাদের মনে বিচিত্র রসের পরিবর্তনশীল প্রবাহ যেভাবে তার সঙ্গে মিলিয়েছেন এই নিয়ে চিন্তা করলে গানগুলি শুধু গানের পরিচয় ছাড়িয়ে আশ্চর্য গভীর এক জীবনদর্শনের প্রকাশ হিসাবে ধরা পড়ে। নীচে কবির এই চেতনার মূলধারা থেকে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো।

৩.১। কবির কাছে গ্রীষ্মে মানবমনে তৃষ্ণা, একাকীত্ব, উদাস বেদনার প্রকাশ, কিম্বা যেন মৌন তাপস ধ্যানে মগ্ন। গ্রীষ্মের রক্তচোখের পেছনে থাকে স্নেহের স্নিগ্ধতা, যার বার্তা এনে দেয় ঝড়ের সংকেত :

প্রখর তাপনতাপে আকাশ তৃষার কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘপথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে,
‘খোলো খোলো দ্বার’।
বাহির হয়েছি কবে কার আহ্বান রবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার ॥
বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্মর বীণা,
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো না পাই তার।
আজি সারা দিন ধরে প্রাণে সুর ওঠে ভরে,
একেলা কেমন করে বহিব গানের ভার ॥

***

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তিভরা কোন বেদনার মায়া
স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে-মনে ॥

***

তপস্বিনী হে ধরনী, ওই যে তাপের বেলা আসে -
তপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে ॥

***

নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো
তোমার রক্ত নয়ন মেলে।
ভীষণ তোমার প্রলয় সাধণ প্রাণের বাঁধণ যত
যেন হানবে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ যে আশার ভাষা উঠল বেজে,
দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ সুধা ঢেলে ॥

৩.২.১। বর্ষা ছিল কবির সবচেয়ে প্রিয় ঋতু, যে প্রেমিকের মতোই তাঁর সমস্ত চেতনাকে জড়িয়ে থাকতো। বর্ষার বর্ষণে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন, বর্ষার বিচিত্র রূপের মধ্যে মানবমনের গভীরতম আকুতি নিবিড়তম বেদনা প্রকাশের একটা ভাষা যেন খুঁজে পেতেন। বর্ষা আমাদের প্রেমিকের সঙ্গে মিলন-আকাঙ্ক্ষাকে, বহু দূরের সুদূর আদিকালের মানুষের সঙ্গে মিলনের তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তোলে। অবিশ্রাম বারিধারা আমাদের অহং ও পার্থিব জীবনের চেতনা ছাড়িয়ে প্রেমিককে সেই কথা বলবার মুহূর্তটি এনে দেয় যে কথা এ জীবনে বলা হলো না। বর্ষা আমার নিজেরই স্বপ্নরূপের সঙ্গে আমাকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ বনে, আকাশে মেঘলোকে অভিসারে নিয়ে যায়।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।

শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে ॥

এ কী গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধরে
সকল আকাশ আকুল করে ॥ ......

সে কে বাঁশি বাজিয়েছিল কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল সুদূল আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশির ধ্বনিখানি আজ আষাঢ় দিল আনি,
সেই অগোচরের তরে আমার হৃদয় নিল হরে ॥

আবার সেই একই কালাতীত মিলনের বাণী অবিরাম,
অনন্ত বর্ষার মধ্য দিয়ে।

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা। ...

৩.২.২। বর্ষায় প্রেমিকের জন্য নতুন সাজে সাজবার সময়, দুয়ারে সেই আঘাতটির জন্য প্রতীক্ষার সময়, স্বপ্ন দেখবার সময় যে, সে আসছে। বিরহী বিরহিনী নীরবে দয়িতের সঙ্গে মিলনের ধ্যানে মগ্ন, কারো অধীর অশ্রু ক্রন্দনরত সিক্ত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বিরহবেদনা ঘাসের নি:শ্বাসের কাঁপনে কাঁপছে -- প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার এরকম প্রকাশ কথা-কাব্য সাহিত্যে বিরল :

এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী ॥...
কেতকী কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে । ...
***

কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে .....
আজি এ ভরষা নিবিড় তিমির, ঝরোঝরো জল জীর্ণ কুটীর
বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে
জেগে বসে আছি একা রে। .....

***

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরান সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম -
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার ॥

***

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা ॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে-
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ॥

***

আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলো-ছলো আঁখি মেঘে মেঘে।
বিরহ দিগন্ত পারায়ে সারা রাতি অনিমেষে আছে জেগে ॥

***

যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায় গোধূলি-খনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে, কাঁপে নিঃশ্বাসে --
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া
ছায়ায় রয়েছে লেগে ॥

***

৩.২.৩। আর এমনি দিনে বলা যায় তাকে যে কথাটি এই জীবনে বলা হলো না
:

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়। ......
ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায় -

এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥

৩.২.৪। সবশেষে, বর্ষা এসে কবিকে নিয়ে যায় তাঁর নিজের স্বপ্নস্বরূপেরই সঙ্গে অভিসারে :

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে ॥

....
আমার স্বপ্নরূপ বাহির হয়ে এল,
সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্নদোসর সাথে
সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥
আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে ---
ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্র রবে গেল হারায়ে,
মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে
মত্ত হাওয়ার ছন্দে
মেঘে মেঘে তড়িৎ শিখার ভুজঙ্গ প্রয়াতে
সে দিন তিমির নিবিড় রাতে ॥

৩.৩। শরত আমাদের জন্য আনে অনাবিল আনন্দ যার কোন কারণ নেই। নীল আকাশে সাদা মেঘের পবিত্রতা, শিশির-ভেজা ভোরের মধ্য দিয়ে সোনালি সূর্যের প্রথম হাসিটি, মহীয়সী কালো রাত্রির কপালে ঝলমলে অগুনতি তারা, কোথাও কোন ম্লানতা নেই উদ্বেগ নেই যাতনা নেই -- ধরণীর এই সৌন্দর্য আমাদের আকুল করে তোলে সব পার্থিব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে আজানার গান গেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে, আর আনন্দিত চিত্তে প্রশ্ন জাগে -- কে আমাকে এমন করে ডাকছে ?

আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা -
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা ॥

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন বনে যাই।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নই কভু দেখি নই এমন তরণী বাওয়া ॥

কোন সাগরের পার হতে আনে কোন সুদূরের ধন -
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওযা সব পাওয়া ॥
***

‘

তোমরা যা বল তাই বলো আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা যায় বয়ে কেমন বিনা কারণে ॥
....

৩.৪। ধরিত্রী তার ফসল দিয়েছে -- এখন শিশিরে ভেজা রাতে শয্যার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হেমন্তের ভরা চাঁদ যেন আশা জাগায় ফুল ফুটবে, বসন্ত আসবে। কিন্তু প্রকৃতি নিরাভরণ ও ক্লান্ত, আকাশটাকে সে ঢেকে দিচ্ছে তার আচঁল দিয়ে :

হেমন্ত কোন্ বসন্তেরই বাণী পূর্ণশশী ওই যে দিল আনি।
বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।
***

হায় হেমন্তলক্ষী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা -
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা ॥
***

ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা ॥

৩.৫। শীত যখন আসে, তখনো ফসল রয়েছে ঘরে তোলবার জন্য, তাই তখনো আনন্দ করবার সময়। কিন্তু প্রকৃতি তার বসন ছেড়ে ফেলেছে, বৈরাগী সন্ন্যাসীর মূর্তি ধরছে। কবির মধ্যে মিষ্টিক্ আবার জেগে উঠেছে। ভাবছে এইভাবেই বোধ হয় সব আভরণ আর পার্থিব বিলাস ছেড়ে, সব হারিয়ে পরমকে পাওয়া যায় :

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় যে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায় ॥
***

শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই শীতের বনে
এলে যে সেই শূন্যক্ষণে।
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা দুখের সুরে বরণ মালা
গাঁথি মনে মনে শূন্যখানে ॥
***

শীতের হাওয়ার লাগন নাচন আমলকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে ॥
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে
তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অন্তরালে ॥
শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে ডেকে
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে ॥

৩.৬। তারপরে আসে বসন্ত আবার সব ভরে দিতে। ধরনী ফুলে পল্লবে নতুন করে সাজে। কবি আবার আনন্দে গান গেয়ে ওঠেন। বৈরাগী সন্ন্যাসী জীবনে ফিরে আসে জীবনের সৌন্দর্য-সুধা পান করতে। যৌবনের কাছে, প্রেমের কাছে, মানুষ আবার আত্মসমর্পন করে। প্রস্ফুটিত জীবনের আনন্দের
সঙ্গে অপূর্ণ বাসনার বেদনাও জড়িয়ে থাকে -- জীবনের দ্বৈত চরিত্র এমনিই। শেষে বসন্তের যাবার সময় আসে, মন দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কিন্তু যা সে দিয়ে যায় তার স্মৃতি মনকে ভরে রাখে, আর বারে বারে ধরণী এমনিভাবে হেসে উঠবে এমনি করে নতুন সাজে সাজবে এই আশ্বাস জীবনের চেতনাকে প্রেরণা দেয় :

ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্, লাগল যে দোল্ ।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল্ ...
রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা হাসি মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হল্লোল।
***

আকাশ আমায় ভরল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়,
নাচের আবীর হওয়ায় হানে ॥

***

এবার তো যৌবনের কাছে মেনেছ হার মেনেছ?
'মেনেছি'।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ ?
'জেনেছি'।
মরণ-মাঝে অমৃতকে জেনেছ?
'জেনেছি'।

***

দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয়-আকাশে,
দোল ফাগুনের চাঁদের আলোর সুধায় মাখা সে ॥

***

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।

***

এখনি বনের গান বন্ধু, হয় নি তো অবসান-
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা
ও তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল, এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস বলি ॥

***

বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির পরে কী আদরে ॥
তাই সে ধূলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে কী আদরে ॥
তেমনি পরশ লেগেছে মোর হৃদয় তলে,
সে যে তাই ধন্য হল মন্ত্রবলে।
তাই প্রাণে কোন মায়া জাগে, বারে বারে পুলক লাগে,
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে
কী আদরে ॥

৪। উপসংহার

প্রকৃতি শুধু আমাদের জীবন ধারণের জন্য জীবনের সম্ভোগের জন্য একটি সম্পদ নয় - এটি আমাদেরই একটি অংশ। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা নিজেদের থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও আবেগ থেকে, তা প্রকাশ করবার জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাষা থেকে, আমাদের সৌন্দর্য ও যৌবন-চেতনা থেকে, আমাদের কর্তৃত্বের নয়, ভালোবাসর চেতনা থেকে, এবং পরমের সঙ্গে আমাদের একাত্মবোধ থেকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধরিত্রীর কাছে ফিরে যেতে ডাক দিয়েছেন, তার আনন্দ-বেদনার সঙ্গে আমাদের আনন্দ-বেদনা মেলাতে বলেছেন, তাঁর গানের সঙ্গে আমাদের গান তার জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন, এক করতে বলেছেন :

ফিরে চল্ মাটির টানে -
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে কানে গানে ॥...

***

আর ডাক দিয়েছেন আমাদের বৃক্ষ-রোপনের খেলায় মন মাতাতে :

আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল -
মানবের স্নেহসঙ্গ নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্।

আজকে রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি শিল্প ও একটি চিত্ত বিনোদনী কৌশল হিসেবে। আমাদের পরিবেশ-রক্ষার আন্দোলনও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চিন্তা থেকে অনুপ্রেরণা নিচ্ছে না। রবীন্দ্রসংগীতকে জীবনের ও তার গভীরতম আবেগ অনুভূতির প্রকাশ হিসাবে গাইলে -- যে জীবন প্রকৃতির সঙ্গে মিলন ছাড়া তার পূর্ণতা পায় না - এ গান গাওয়া অনেক বেশি সার্থক হয়, আর আমাদের পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনও অনেক বেশি সমৃদ্ধ হতে পারে ॥

প্রথম প্রকাশ: পরিবেশপত্র বর্ষ ১, সংখ্যা ১, আগষ্ট ১৯৯৬